যা দেখি কিছু বুঝি বাকিটা বুঝি না

মঈনুল আহসান সাবের

রাত এগারোটায় সারাদিনের অবসাদ দূর হয়ে যায় দুটি বাক্যে– 'অ্যাই থাম।' সাপ্তাহিক পত্রিকা, এত দেরি হয় না, কিন্তু ওদিন সোমবার, পেস্টিং, তাই প্রধান প্রতিবেদক নাবিলের ওপর বাকি অংশ দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি ফিরছি। গাড়ির চালককে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তাই অফিসের সিএনজি চালিত ট্যাক্সি ভরসা। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, চোখ কিছুটা ধরে এসেছে, তখন ধমকের মতো শব্দ দুটো কানে এসে বাজে 'অ্যাই থাম।' আমি চোখ পুরো খুলতে খুলতে নিশ্চিত হই– হাইজ্যাকার। এর আগেও কয়েকবার ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছি, পড়তে গেছি; তবে প্রতিবারই, হয়তো আমার গোয়ার্তুমির জন্য, কিংবা পরিস্থিতি আমার দিকে ছিল বলে, তাদের নিরাশ হতে হয়েছে। এবারও এদের নিরাশ করব কীভাবে, এই চিন্তাটাই মাথায় প্রথম আসে। ততক্ষণে চোখ পুরোপুরি খুলেছে আমার এবং দেখা হয়ে গেছে– ছিতাইকারী নয়, র‍্যাব।

আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। ছিনতাইকারীই কেন ভেবেছিলাম! তারা তো নানা কৌশল ব্যবহার করে। থামাতে হলে 'থামুন' বলে, 'থামো' বলে, 'থাম'ও বলে, প্রয়োজনমতো। সবসময়, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে 'থাম' বলার অধিকার এ দেশে শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোরই আছে। আমার এই চিন্তা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বরং 'অ্যাই থাম' শব্দ দুটো আবার ফিরে আসে এবং আমি, ছিনতাইকারীর হাতে না হলেও, আক্রান্ত হই। চালক ও আমি ছাড়া আর কেউ নেই ট্যাক্সিতে। আমার বারবার মনে হতে থাকে, যদিও ধরে নেয়া যায়, শব্দ দুটো চালককে উদ্দেশ্য করেই বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু আমি তার বাইরে নই, 'অ্যাই থাম' আমাকেও বলা হয়েছে। কারণ চালক তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য আরোহী, তার পরিচয়। যদি এই ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে এটাই মেনেও নেই– চালককে উদ্দেশ্য করেই ঐ কথা বলা হয়েছে, এই প্রশ্ন আমি মন থেকে তাড়াতে পারি না, র‍্যাবের একজন সাধারণ সদস্যের কি কাউকে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই 'তুই' বলার অধিকার আছে? আসলে, ব্যাপারটা এমনই যে এর পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকতে পারে না। আমরা কি এরকম কোনও দৃশ্যের কথা আমাদের দূর-কল্পনায়ও আনতে পারি– 'অ্যাই থাম' বলার পর চালক ট্যাক্সি থামিয়েছে এবং মুখ বের করে জানতে চেয়েছে, 'কীরে, কী ব্যাপার?' বেশ, ঘটনা থেকে চালক সরে থাক, আমিই কি পারি তাদের 'তুই' বা 'তুমি' করে বলতে? যদি না পারি, তারা পারে কোন অধিকারে? চাকরি এবং উর্দি বলে?

বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরে আসি। সম্ভবত বছর দেড়-দুই আগে স্কটল্যান্ডের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী পুলিশ বাংলাদেশীকে 'স্যার' সম্বোধন না করায়, মর্যাদাবোধসম্পন্ন বাংলাদেশী আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছিল এবং 'স্যার' সম্বোধন না করা পুলিশটি বিভাগীয় শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, এ ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়। এ দেশে মামলা করা মানে এক লক্ষটি ঝামেলা। আর, মামলার কথা কেউ বোধ হয় ভাবেনও না। এ যেন ধরেই নেয়া আছে, র‍্যাব বা পুলিশ তো বটেই টিডিপি ভিডিপিও আমাকে কিংবা যে কাউকে 'তুই' করে বলতেই পারে।

আমি জানি না, যে পর্যায়েরই হোক না কেন, জনগণের সঙ্গে ব্যবহারটি কেমন হবে– তা বোঝাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কোনও ক্লাস করতে হয় কি না, কিংবা কোনও ওরিয়েন্টেশন কোর্স? বিশেষ করে এসব বাহিনীর যারা সাধারণ সদস্য, তাদের জন্য? হয়তো আছে, হয়তো নেই। কিংবা সংশ্লিষ্ট যারা, তারা হয়তো র‍্যাবকে ভয়ের প্রতীক হিসাবেই রেখে দিতে চান। জনগণের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য, 'আমি পুলিশ' বা 'আমি র‍্যাব' এই গর্বে; সেটি তারা বজায়ই রাখতে চান। এতে কী আর এমন অসুবিধা, মাঝে মাঝে শুধু মন খারাপ হবে, এই যা। আর একটা ব্যাপার অবশ্য ঘটতে পারে। অভিধান বলে একটা ব্যাপার আছে। অভিধান বদলায়, নতুন শব্দ যোগ হয়, সমার্থ শব্দও আসে। বছর কয়েক পর নতুন সংস্করণের কোনও অভিধানে 'আতঙ্কে'র সমার্থ শব্দ হিসাবে যদি 'র‍্যাব' যুক্ত হয়, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

২.

আমাদের নগর সংস্কৃতির চিত্রটি বেশ অনেকদিন ধরেই বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন দৃশ্য আর নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। এই কিছুদিন হলো আমরা দেখছি 'ব্যক্তিগত' ও 'স্বেচ্ছায়' শব্দ দুটো বেশ বাজার পেল। আমাদের ১০ উপদেষ্টার একজন কিছুদিন আগেই স্বেচ্ছায় সরে পড়েছিলেন। কারণ ওনার নাকি, আরেক উপদেষ্টার ভাষ্য অনুযায়ী, আত্মমর্যাদাবোধ বেশি। তা, হতে পারে সেটা, তবে মর্যাদাবোধ বেশি হলেও দায়িত্ববোধ যে কম, সেটার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই চারজন উপদেষ্টা একযোগে পদত্যাগ করলেন। সবার পদত্যাগের কারণ কিন্তু একটাই– ব্যক্তিগত। কেউ অসুস্থ হননি, কেউ পরিবারকে সময় দিতে না পারার কথা বলেননি, কেউ ক্লান্তির কথা বলেননি, সাহস করে কেউ নিজের ব্যর্থতার কথা দূরে থাক, সীমাবদ্ধতার কথাও বলেননি। কী আর করা যাবে, তোতাপাখি যে একটা কথাই শিখেছে– 'ব্যক্তিগত'। কেউ কেউ নিশ্চয় বললেন, ব্যক্তিগত শব্দটির ব্যাপ্তি কি কম? কে বলে কম, আমিও বলি না। 'ব্যক্তিগত' আসলে অনেক বড় একটা বাকসো, তার মধ্যে অনেক কিছুই এঁটে যায়। এঁটে গেলও, তবে মনের খুঁতখুঁতানি গেল না। আহারে, একজনও কি ব্যক্তিগত কারণের বাইরে যেতে পারলেন না? আমরা জানি কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানো মোটেও

সমীচীন নয়, কিন্তু উৎসাহটা চাপা দেই কী করে, বিশেষ করে পত্র-পত্রিকায় তাদের ছবি যখন দেখতাম অহরহ, টিভি পর্দাজুড়ে দেখতাম তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আর কত কথাই- না তারা বলতেন। তাই বড় সাধ জাগে মনে– আহা, তাদের এই 'ব্যক্তিগত' ব্যাপারটা একটু যদি বুঝতাম। এর মধ্যে একজন অবশ্য জানিয়েছেন- তারা পরীক্ষিত ব্যক্তি। তারা একটি মিশন নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দিয়েছিলেন, চাকরি করতে যাননি। এ তো খুবই ন্যায্য কথা। এখন তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি 'মিশন' শেষ হয়েছে। তবে, আবার খটকাও লাগছে তার শেষ কথায়। বলেছেন, 'পদত্যাগ করার পর এখন আরও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে কাজ করার সুযোগ আছে আমার।' নেই কে বলল, প্রশ্ন বলি, ভীতি বলি, একটাই; উপদেষ্টা হিসাবে তুলনামূলক ছোট পরিমণ্ডলে কাজ করার সময় তিনি টিভি পর্দা তো বটেই, ধরিত্রীই যেমন কাঁপিয়েছেন, আর বড় পরিমণ্ডলে উনি কাজ করতে গেলে কী যে হবে।

৩.

এ লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছানোর আগেই হয়তো বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটবে। আমি জরুরি আইনে গ্রেফতারকৃত শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলার রায়ের কথা বলছি। আবার, এমনও হতে পারে, কারও ইমেজ ক্ষুণ্ন হবে না এমন একটি অবস্থায় না পৌঁছানোর কারণে মামলার রায়ের নতুন তারিখও পড়তে পারে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবশ্য বেশ আগেই মুক্তি পেয়েছেন। ঢা.বি. শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারটি কীভাবে সম্পন্ন হবে, এটি ফায়সালা করা যাচ্ছে না বলে ঝুলে আছে। সাধারণ মানুষজন অবশ্য খুব সহজেই বলবেন– কেন, এর তো খুব সহজ সমাধান আছে। মামলায় রায়ে শিক্ষকরা যদি দোষী সাব্যস্ত হয়েও থাকেন, রায় ঘোষণার পরদিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেই পারেন। না, ব্যাপারটি সম্ভবত এখন আর এত সহজ জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। অমন এক রায়ে সরকার পক্ষ খুশি হবেন- যাক, একদিনের জন্য হলেও দোষী বানিয়ে জেল খাটানো গেছে, অর্থাৎ যারা মামলা করেছেন, তাদের ইমেজ গৌরবর্ণেরই থাকবে। ওদিকে আবার ঢা.বি-র শিক্ষকরা আদালতে স্পষ্ট করে বলেছেন- তারা নির্দোষ, তারা জরুরি আইন ভঙ্গ করেননি, তারা শিক্ষক হিসাবে তাদের দায়িত্ব সেভাবেই পালন করেছেন, যেভাবে পালন করা উচিত। তাদের কথায় এ বিষয়টি পরিষ্কার– দোষীর তকমা গায়ে নিতে তারা অনিচ্ছুক, দোষী হয়ে একদিন পরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমাও তারা চাচ্ছেন না। তারা চাচ্ছেন নির্দোষ হিসাবে সহজ সরল সরাসরি মুক্তি।

ঢা.বি. শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারটি কীভাবে সম্পন্ন হবে, এটি ফায়সালা করা যাচ্ছে না বলে ঝুলে আছে। সাধারণ মানুষজন অবশ্য খুব সহজেই বলবেন– কেন, এর তো খুব সহজ সমাধান আছে। মামলায় রায়ে শিক্ষকরা যদি দোষী সাব্যস্ত হয়েও থাকেন, রায় ঘোষণার পরদিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেই পারেন। না, ব্যাপারটি সম্ভবত এখন আর এত সহজ জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই

এটা আসলে খুব সাধারণভাবে বিষয়টিকে দেখা। রায় কী হবে তা আদালত জানে, শিক্ষকরা কী করবেন, তা-ও তারাই জানেন। কী করলে কী হবে, কী করলে কী হবে না– এসব কথা খাবনামায় থাকে, 'এলেম দ্বারা' যারা চোর ধরেন, তারাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন। আমরা ব্যবহার করতে পারি না, আমরা আন্দাজ করতে পারি। তবে সেই আন্দাজের প্রসঙ্গও যাক। মূল প্রসঙ্গটি অবশ্য যাচ্ছে না। শিক্ষকদের ব্যাপারটি ঝুলে আছে অনেকদিন। কেউ যদি বলেন, ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, বলতেও পারেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে ত্বরিত গতিতে। শিক্ষকদের সবাইকে সমান চোখে আমরা দেখি না। ছাত্রী হয়রানিসহ তাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগই- না আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। তাদের কেউ কেউ একসঙ্গে ৫২ জনকেও ফার্স্টক্লাস দিয়ে ফেলতে পারেন। তবে মুষ্টিমেয় এদের পাশাপাশি, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য শিক্ষকের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। এই বরেণ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যদি দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা নেয়া যায়, তবে আমাদের পোশাকশিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে যারা নেমেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না! ঘটনা একটির-পর-একটি ঘটছেই। একের-পর-পর কারখানা ভাঙচুর, লুটপাট, অন্য কারখানার শ্রমিকদের কাজে বাধা দেওয়া চলছেই। পাশাপাশি আছে সড়ক অবরোধ, যানবাহন ভাঙ্গা ও অগ্নিসংযোগ। বারবার শুনছি- ইন্ধনদাতাদের শনাক্ত করা হচ্ছে। তা, এই 'হচ্ছে'টা 'হয়েছে' হবে কবে, আর কবেই- বা তাদের ধরা হবে। শিক্ষকদের ধরা হলো চিতাবাঘের গতিতে, পোশাকশিল্পের শ্রমিক, নেতা ও নেপথ্যের নায়কদের বেলায় কেন কচ্ছপ- গতি? নাকি এরা সবাই জরুরি আইনের বাইরে?... সাধারণ প্রচলিত আইনেরও কি বাইরে? না হলে দু'ক্ষেত্রে দু'ধরনের কর্মপন্থা কেন দেখি আমরা? শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নই আমি, যে যার পেশায় অবশ্যই প্রাপ্য শ্রদ্ধা পাবেন। কিন্তু ছাড় পাবেন শ্রমিকরা, পাবেন না শিক্ষকরা– মানতে মন চায় না।

৪.

গিমে জাদুঘরে যাবে বলে আরও অনেকের সঙ্গে রওনা দিয়েছিল এবং আমাদের এয়ারপোর্ট থেকেই চুরি গিয়েছিল যে দুই মূর্তি, সেই রহস্যের একটি সমাধান

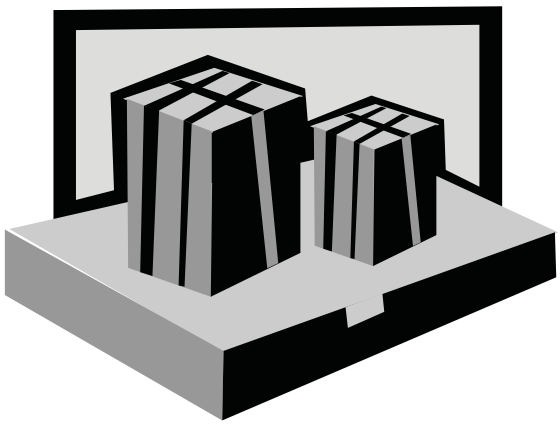

পেশ করা হয়েছে বেশ আগেই। চারপাশে এতকিছু দেখি আর শুনি, সন্দেহপ্রবণ মন অনেককিছুই মেনে নিতে চায় না। তবু গভীর এক অতৃপ্তি নিয়ে মেনেই নিয়েছি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন আছে শুধু। মূর্তি দুটো যে- কার্টন দুটোয় ছিল, সে কার্টনদুটো জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হোক। ও-দুটো আমাদের হঠকারী সিদ্ধান্তের, আমাদের পূর্বাপর বিবেচনায় ব্যর্থতার, আমাদের লোভ-লালসার এবং আমাদের অদক্ষতার নিদর্শন হয়ে থাক।